ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য — শিবদাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩ মার্চ, ১৯৭৪
১৭তম মুদ্রণ ঃ ৫ আগস্ট, ২০১৪
১৮তম মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, ২০১৫
১৯তম মুদ্রণ ঃ ৫ মে, ২০১৬
২০তম মুদ্রণ ঃ ৫ অক্টোবর, ২০২১
২১তম মুদ্রণ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

১৯৭৪ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে বারবাটি স্টেডিয়ামে সারা ভারত ডি এস ও'র উদ্যোগে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জানুয়ারি প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রথম দিনে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি গভীর বিশ্লেষণাত্মক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাষণে সঠিক আদর্শ ও সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে উন্নত সংস্কৃতি ও নীতিনৈতিকতার আধারের ওপর গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র-যুবদের কর্তব্য সম্পর্কে একটি রূপরেখা পেশ করেন। যে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা আমাদের দেশের সমাজজীবনের অগ্রগতির পথে আজ প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন, সাথে সাথে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির সঠিক পথনির্দেশটিও তিনি ছাত্র-যুবদের সামনে তুলে ধরেন।

ইংরেজিতে প্রদত্ত তাঁর এই অত্যন্ত মূল্যবান ভাষণটি ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ প্রথম পুস্তিকাকারে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় এবং বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়। বক্তৃতাটি বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা সত্ত্বেও এবং নানা মহল থেকে তাগাদা আসা সত্ত্বেও বহু কারণে দীর্ঘদিন তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৮৭ সালের ২৯ আগস্ট বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর ২১তম মুদ্রণ প্রকাশ করা হল। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে স্বভাবতই তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমাদের। আমরা মনে করি, আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে তীব্র সংকট ঘনীভূত হয়েছে তার মোকাবিলার প্রয়োজনে ছাত্র-যুবদের সামনে এই পুস্তিকা পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে।

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ,

আমার কাছে ইতিমধ্যেই অনুরোধ এসেছে আমি যেন ইংরেজিতে আমার বক্তব্য রাখি আবার একই সঙ্গে হিন্দিতেও বলি। বোধহয় এর মানে দাঁড়াবে হিন্দি এবং ইংরেজির এক অদ্ভুত ধরনের জগাখিচুড়ি। কি করে এভাবে বলা যায় তা আমার জানা নেই। তবে আজকের এই সমাবেশে বহু রাজ্য থেকে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিনিধিবৃন্দের কম্পোজিশনের কথা বিবেচনা করে আমি আমার বক্তব্য ইংরেজিতেই রাখব।

কমরেডস্, আপনারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বহু দূর দূরান্তর থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বহু কষ্ট স্বীকার করে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনের কার্যক্রম ও আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এখানে এসেছেন। আপনারা এখানে এসেছেন আপনাদের কর্মসূচি ঠিক করবার জন্য। অর্থাৎ, আমাদের জীবনের সামনে বর্তমানে যে সকল সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ এবং সঠিক ধারণার ভিত্তিতে সংগ্রামের রণনীতি নির্ধারণ করবার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন। আমি সারা ভারত ডি এস ও সম্মেলনের নেতা ও সংগঠকদের, বিশেষ করে ওড়িশা রাজ্যের ডি এস ও কর্মীদের — যাঁরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন এবং এই বিশাল একটা সম্মেলনের নানান সমস্যাকে মোকাবিলা করে তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন — তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কমরেডস্, সারা ভারত ডি এস ও'র উদ্যোগে আয়োজিত এই সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন আমাদের দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সমাজজীবনে রুচি-সংস্কৃতি ও

নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সঙ্কট আরও গভীরে দেখা দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করছেন এবং আমার ধারণা দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও গভীর উদ্বেগ ও আশংকার সাথে লক্ষ্য করছেন যে, আমাদের রুচি-নীতিনৈতিকতার মান ক্রমাগত দ্রুত নেমে যাচ্ছে। আজকের দিনে নীতিনৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক মানের কোনরকম পরোয়া না করা কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নৈতিক অবনমন আজ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং এমন নগ্নরূপে দেখা দিয়েছে যে, অনেকের কাছে এটা জৈবিক প্রবৃত্তির মতই একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত 'এমপিরিসিস্ট'-রা (তত্ত্ববিবর্জিত অভিজ্ঞতাবাদীরা) মোটামুটি এরকম সিদ্ধান্তই করে বসে আছেন। ব্যাপারটা যেন এরকম যে, ভারতবর্ষে এখন এমন একটা জাতি বাস করছে যাদের যেকোন মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনরকম পরোয়া না করাটাই একটা স্বাভাবিক জৈবিক ধর্ম। এর দ্বারা তাঁরা যেটা বোঝাতে চাইছেন, তা হচ্ছে, যেন আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এমন কতকগুলো অন্তর্নিহিত (intrinsic) সহজাত জৈবিক বৃত্তি কাজ করছে যার ফলে কোনরকম মূল্যবোধের মূল্য দিতেই তারা অক্ষম। আমি মনে করি, এরকম সিদ্ধান্তে আসা শুধু যে অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক তাই নয়, সোজা কথায় এটা উদ্ভটও বটে। সে যাই হোক, আমাদের দেশের প্রতিটি সৎ, চিন্তাশীল ব্যক্তির মনকে যে ভাবনা প্রতি মুহূর্তে আলোড়িত করে তুলছে, তা হ'ল, 'কেন এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি? কি করে আমাদের সমাজে এই অসহনীয় এবং হৃদয়বিদারক (heart breaking) পরিস্থিতির সৃষ্টি হল?' সমস্যাটির গভীরে গিয়ে আপনাদের তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ, আমি মনে করি, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি বিষয়টা আমরা ঠিকমত ধরতে এবং ঠিকমত বুঝে তার সঠিক উত্তরটা বার করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়ে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামোর মৌলিক

পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রয়েছে। কারণ, আপনারা সকলেই জানেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমস্ত সামাজিক সমস্যাই সবসময়েই কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রশ্নের সাথে, কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে যেগুলির সমাধান ছাড়া এইসব সমস্যার কোনটারই সুরাহা করা সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলি দেশের রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সাথে — যাকে আমরা পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলি — তার সাথে যুক্ত। প্রতিটি সামাজিক ব্যাধি, যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে তা এই বস্তুগত ভিত্তি (material base) থেকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থেকে উদ্ভুত হচ্ছে। আবার এই দুটির মধ্যে, মনে রাখা প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যা শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন, যা ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী — দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে রাষ্ট্রকে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যপূরণ ও শ্রেণীশাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও সংহত ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করে।

কমরেডস্, আপনারা মনে রাখবেন, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের দলগুলো যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, বাস্তবে জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এমনকি যখন তারা জাতি ও জাতীয় স্বার্থের কথা বলে তখনও তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল, জনসাধারণের দেশাত্মবোধকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীউদ্দেশ্যকে হাসিল করা। ফলে যে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে খানিকটা প্রগতিশীল ছিল এবং ততটুকু অর্থে সেদিন জনগণের স্বার্থ পূরণ করেছিল, আজ তা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে পুরোপুরি সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে এবং জনসাধারণকে প্রতারণা করে ও ধাপ্পা দিয়ে তাদের দৃষ্টিকে প্রকৃত সমস্যা থেকে সরিয়ে বিপথে চালিত করার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। জনসাধারণকে বিপ্লবী আন্দোলনের মূল ধারা থেকে দূরে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং

পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলো প্রায়ই এই প্রতারণামূলক হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করে থাকে।

বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলোর এই কৌশলে জনসাধারণ যাতে প্রতারিত না হন তার জন্য তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে আপনাদের সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। আমাদের জাতি একটা অবিভাজ্য জাতি নয়। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, কোন সচেতন মানুষই এই কঠোর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমাদের সমাজ একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।

কমরেডস্ আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসে উৎপাদনের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে এসে সমাজে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রামগুলির জন্ম হয়েছে এবং যখন থেকে এগুলির জন্ম হয়েছে তখন থেকেই বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি আমাদের চেতনানিরপেক্ষ সত্তা হিসেবেই সমাজে অবস্থান করে চলেছে। একই সাথে একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, মানবসমাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণীসংগ্রামই মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের পথে মানব ইতিহাস থেকে যতদিন শ্রেণী, শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীর হাতে দমন পীড়নের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র অবলুপ্ত না হচ্ছে ততদিন সমাজে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে। সুতরাং এরকম একটি পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐক্য, শিক্ষা এবং শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না। এই সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল — তা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে প্রত্যক্ষভাবে হোক্ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে হোক্ রক্ষা করছে, নাকি মেহনতী মানুষের ও তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থকে রক্ষা করছে — সেটা শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে। সংগ্রামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত পথ শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বিপজ্জনকও বটে। যে কোন সৎ, চিন্তাশীল মানুষ, যাঁরা বিপ্লবের কথা বলেন, তাঁদের একথাটা বুঝতেই হবে। কারণ, যদি তাঁরা সত্যিসত্যিই

সমাজের পরিবর্তন আনতে চান এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে চান তাহলে যে বিশেষ নিয়মগুলো শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে ওঠার পথে সমস্ত ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সমস্ত নিয়মগুলোকে তাঁদের জানতেই হবে। আর তা না জানা পর্যন্ত কোনমতেই আমরা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারব না — সমাজ পরিবর্তন ও বিপ্লবের আকাঙ্খা আমাদের যতই থাকুক না কেন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন প্রভাবই আমরা ফেলতে পারব না। এমতাবস্থায় আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত তত্ত্ব হয়ে পড়বে বন্ধ্যা এবং সমস্ত ক্রিয়া অন্ধ ক্রিয়ায় পর্যবসিত হবে। এটা আমি বিশ্বাস করি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি। তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাস করে শ্রেণী এবং শ্রেণীস্বার্থের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত না করে যদি কেউ সাধারণভাবে শুধু ‘জাতি’, ‘জাতীয় স্বার্থ’, ‘সামাজিক অগ্রগতি’, ‘সামাজিক স্বার্থ’, ‘শিক্ষার সংস্কার’ প্রভৃতির কথা বলেন তাহলে বলতে হয় তিনি একজন অজ্ঞ, মূর্খ, আর না হলে তিনি একজন ভণ্ড। এই প্রসঙ্গে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) -এর কথা উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। তারা উভয়েই নিজেদের আজও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করে। এই দুটি দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন এ আই এস এফ এবং এস এফ আই শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সুর মিলিয়েই ‘চাকুরিমুখী’, ‘কর্মমুখী’ বা ‘উৎপাদনমুখী’ শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলছে। অথচ, তারা কি এটা আদৌ বোঝে না যে, উৎপাদনবৃদ্ধির অজুহাত খাড়া করে ‘চাকুরিমুখী’ বা ‘কর্মমুখী শিক্ষা’ প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে নিছক কারিগরি ও নিতান্তই তথ্যসর্বস্ব শিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর চক্রান্ত মাত্র? প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলে তো এটা তাদের না বোঝার কথা নয়। শিক্ষাসংস্কারের নাম করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের দলগুলো এহেন একটি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন যে ওকালতি করে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার অবাক লাগে যখন দেখি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর মত

দলগুলোও শিক্ষা সংস্কারের নাম করে বুর্জোয়াশ্রেণীস্বার্থে রচিত এইরকম একটা হীন পরিকল্পনাকে (scheme) সমর্থন করে এবং এইসব প্রশ্নে প্রায় একই সুরে কথা বলে। এ অবস্থায় এদের কি বলব — অজ্ঞ, নির্বোধ, নাকি ভণ্ড?

যদিও আমি জানি যে, জনসাধারণ এবং আপনাদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা শ্রেণী এবং শ্রেণীস্বার্থের সাথে যুক্ত না করে, অর্থাৎ সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, যে কোন বিষয়কে কিভাবে তার সাথে যুক্ত করতে হয় সেটা না জেনে, সচরাচর সেইসব বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সাধারণভাবেই মতামত দিয়ে থাকেন। আপনারা এ ব্যাপারে সচেতন কি সচেতন নয় সেটা আদৌ বড় কথা নয়। এই শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে আপনারা অজ্ঞ থাকতে পারেন, যদিও মনে রাখা দরকার, আপনাদের জীবন ও চিন্তাজগতে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং তার প্রত্যক্ষ ফল বর্তায়। ফলে এই বিষয়গুলোকে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীস্বার্থের সাথে কেমন করে সংযোজিত করতে হয় তা যদি আপনারা না জনেন তাহলে নিষ্ঠা ও সততা থাকা সত্ত্বেও আপনারা অনিবার্যভাবে ভুল করে বসবেন। মনে রাখবেন, সততা এবং নিষ্ঠা হচ্ছে একেবারে গোড়ার কথা — অ আ ক খ — যা ছাড়া কোন কাজই করা যায় না। কারণ, একটা বড় আদর্শ, একটা সঠিক তত্ত্ব এবং সঠিক লাইন আয়ত্ত করা সত্ত্বেও যদি কেউ সৎ এবং নিষ্ঠাবান না হন তাহলে তিনি তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন না, কার্যকরী করতে পারবেন না। বিপ্লবীদের ক্ষেত্রেই হোক, আর প্রতিবিপ্লবীদের ক্ষেত্রেই হোক, যে কোন ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে তাঁদের সততা চাই। যদি সত্যিই তাঁরা কিছু করতে চান, রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে চান, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লব যাই তাঁরা চান না কেন, তার জন্য তাঁদের নিষ্ঠা চাই, চাই প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাবোধ ও দৃঢ়চিত্ততা। এগুলি হচ্ছে মূল বিষয়। চরিত্রের এই গুণগুলি ছাড়া আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু তারপরেই যেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটা সবচেয়ে জরুরি বিষয় তা হচ্ছে, সঠিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করা — যা না হলে হাজার নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনারা কাজের কাজ কিছুই করতে পারবেন না, বরং ক্ষতিই করে বসবেন।

কারণ, যখনই যা কিছু আপনারা করেন যদি জনসাধারণের স্বার্থকে তা রক্ষা না করে, সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত না করে তাহলে তা নিরপেক্ষ বা 'কিছুই নয়', এমন নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, প্রগতিশীল আন্দোলনের উপর অনিবার্যভাবে তার বিরূপ ফল বর্তাবে এবং তা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতকেই শক্তিশালী করবে। কেননা প্রতিটি কাজেরই প্রতিক্রিয়া আছে। কাজটা যদি ঠিক হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়াটাও সঠিক হবে। কিন্তু কাজটা যদি ভুল হয় তাহলে ভাববেন না যে, তার কোনও প্রতিক্রিয়াই হবে না। না, ব্যাপারটা এমন নয়। কাজটা ভুল হলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া হবে এবং প্রচলিত শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সংহত করতে তা কোন না কোনভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সুযোগ করে দেবে। সুতরাং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন এবং সংগ্রামের সঠিক কর্মসূচি নির্ধারণ করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। আপনারা এটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না, বা বিষয়টিকে খুব হাল্কাভাবে দেখে এমন বলতে পারেন না যে, 'চলো আমরা সংগ্রাম করি, চলো আমরা কাজ করি, সঠিক চিন্তা ও মূল রাজনৈতিক লাইন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনাআপনিই জন্ম নেবে।' যারা হামবড়া, যারা দেমাকি, যারা হীন উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব মন নিয়ে চলে, একমাত্র তারাই মূল বিষয়টিকে গোলমাল করে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত কথা বলে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, কাজ আপনাদের করতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে, কাজ না করলে অনেক ভাল ভাল কর্মসূচি এবং সুন্দর ও মহৎ আদর্শ নিয়েও আপনারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারবেন না — নিজেদের অক্ষম ও অপদার্থ বলেই পরিচয় দেবেন। সেক্ষেত্রে আপনারা ভাল কিছুই করতে পারবেন না। সুতরাং কাজ করাটা হল অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি প্রাথমিক শর্ত। আমাদের সকলের কাছে নিষ্ঠা, কাজ, শৃঙ্খলাবোধ, জনসাধারণের কাছে যাওয়া — সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, সঠিক বিপ্লবী লাইনকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে সংগঠিত করার জন্য শিক্ষিত করে তোলা এবং এই সংগ্রামগুলোকে এমনভাবে এবং এমন কায়দায় পরিচালনা করা যাতে করে এরই মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হতে

পারে। কমরেডস্, জনসাধারণের কাছে আমরা যাই কেন? নিশ্চয়ই শুধুমাত্র প্রচলিত বা পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়ার অর্থে নয়। এখানে শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তা হল, সমস্ত রকমের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং এইভাবে শেষপর্যন্ত জনগণের অপরাজেয় রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া — যা দেশের বুক থেকে স্বৈরাচারী শাসনকে উচ্ছেদ করে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা জনসাধারণের কাছে যাই — রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মতো নিছক সেবাধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যাই না। তাঁরা বরং বিষয়টাকে গোলমাল করে দেন। জনসাধারণের কাছে যাওয়া বড় কাজ, কিন্তু ভ্রান্ত মতাদর্শ নিয়ে যাওয়ার মত চূড়ান্ত ক্ষতিকারক আর কিছু নেই। কারণ, তাঁরা নিজেরাই যেহেতু বিভ্রান্ত (অবশ্য যদি তাঁরা সৎ হন) সেইহেতু জনসাধারণের বিভ্রান্তি বাড়াতেই তাঁরা সাহায্য করেন। তার চেয়েও বড় কথা তাঁরা বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্ধ বিশ্বাসের চোরাগলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে আমি বরং বলব, জনসাধারণকে নিজেদের মত থাকতে দিন, একদিন না একদিন জনসাধারণ নিজেরাই সঠিক পথ খুঁজে নেবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ভুল ধারণা দেবেন না, ভুল পথে তাদের নিয়ে যাবেন না, বিভ্রান্ত করবেন না; তাদের অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার এবং যেসব বহু পুরনো ধ্যানধারণা আজও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে তার সুযোগ নেবেন না। এ সমস্ত কোন কিছুরই সুযোগ আপনারা নেবেন না। ফলে জনগণের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ও আর্থিক দুরবস্থার ভিত্তিতে দৈনন্দিন সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই শুধু নয় — আমরা যখন জনসাধারণের কাছে যাই তাদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করতে — তখন তার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি করে শেষপর্যন্ত জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দেওয়া যায় যাতে করে একদিন একটি সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার মত নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে, অস্ত্রধারণ করতে পারে এবং জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।

তাই আমাদের মত একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জাতির কথা,

জাতীয় স্বার্থের কথা, শিক্ষা ও শিক্ষা সংস্কারের কথা, ছাত্র এবং জনগণের স্বার্থের কথা — এগুলিকে কেউ যদি শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমাজের মধ্যে নিয়ত যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বিচার না করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন এবং তার দ্বারা তিনি অনিবার্যভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যেহেতু কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না, সেহেতু বিচার করার সময় আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, এইসব সমস্যা সম্পর্কে যেকোন দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের অধিকাংশের স্বার্থকে প্রতিফলিত করছে এবং জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের এবং অগ্রগতির পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে, নাকি তা আসলে যে বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজের ধনসম্পদ ও উৎপাদনের যন্ত্রকে আত্মসাৎ করে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করছে।

কমরেডস্, আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হব যে, একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাকে কেবলমাত্র দুটি দৃষ্টিকোণ, দুটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে। এর একটা হল ক্ষমতাসীন শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি — যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন সুরে, এমন ধাঁচে এবং এমন ব্যক্তিদের পরিচালনায় গড়ে তোলা যার ফলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা, পেশাগত অহংবোধ, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা প্রভৃতি কতকগুলি সমাজপ্রগতিবিরোধী মানসিক ধাঁচা (traits of mind) গড়ে ওঠে — যা স্বভাবতই বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার ও সকলপ্রকার পুরনো ভাবনাচিন্তার উপর নির্ভরশীল এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়দায়িত্বের প্রতি বীতস্পৃহ মনোভাব গড়ে তোলে। আর একটা হল বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা, তথা দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, নীতিনৈতিকতা, রুচি, মূল্যবোধ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল ও নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে যে বিপ্লবী আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য

আজ অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরি সেই আন্দোলনের পরিপূরক বৈজ্ঞানিক বিচারধারা ও মানসিকতাকে সুনিশ্চিতভাবে গড়ে তোলবার জন্য যুক্তির চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারকে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সকল প্রশ্নকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষাসমস্যা এবং শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একটি নয়, দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই স্বাভাবিক এবং থাকতে বাধ্য।

আপনারা মনে রাখবেন, আমরা একটা পুঁজিবাদী দেশে বাস করি। হতে পারে উন্নত পশ্চিমী ধনী সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশ পিছিয়ে-পড়া, তাহলেও নিঃসন্দেহে এটা একটা পুঁজিবাদী দেশ। আর এদেশের এই পুঁজিবাদের চরিত্র কি ধরনের? ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মাধ্যমে লগ্নীপুঁজি ও ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে সমাজের গোটা অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নটিকে ধরলে এবং যেভাবে ও যে পরিমাণে পুঁজি সে রপ্তানি করে চলেছে — যেটা পণ্য রপ্তানি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের — সেদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে, আমাদের দেশের পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। এটা আমি গতকালের উদ্বোধনী সমাবেশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাই আজকের সভায় এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এইসব প্রশ্নগুলোকে বারবার বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে শেষপর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার ব্যাপারে অনেক সময় আপনারা পাবেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, এটি একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা একটি জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র, অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আমাদের দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও সংহত করবার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করে চলেছে। আর পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকার্যকরী (obsolete) হয়ে যাওয়ায় সেটা উৎপাদনের বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটা বাধা (brake) হিসাবে কাজ করছে। তাই সে একের পর এক সংকটের জন্ম দিয়ে চলেছে। একটা

সংকট বা অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য বুর্জোয়ারা যে ব্যবস্থা নিচ্ছে তার দ্বারা তারা আরও গভীরতর সঙ্কটের মধ্যেই নিমজ্জিত হচ্ছে। আর এই জিনিসটাই আমাদের দেশে ঘটছে। আমরা একটা সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসছি আরও গভীর সঙ্কটে পড়বার জন্যই। কোনদিক থেকে তার শ্বাস ফেলবার সময় বা অবকাশ পর্যন্ত নেই। এই পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ — আজকের দিনের সঙ্কটজর্জরিত মরণোন্মুখ বিশ্বপুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ থেকে এই পুঁজিবাদের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছিল অবাধ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। তখন বিশ্বপুঁজিবাদের একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ও চরিত্র ছিল এবং পুঁজিবাদের ভিতরের ও বাইরের বাজার ক্রমাগত বিস্তারলাভ করছিল। পুঁজিবাদের সেই প্রথম বিকাশের যুগে সে মিলিটারি ও আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি অনেক বেশী নির্ভরশীল ছিল। আজ বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ। আজ সে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করেছে। সর্বোপরি এই পুঁজিবাদ আজ দুনিয়াজোড়া তৃতীয় তীব্র সঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারই ফলে সে একের পর এক সঙ্কটের জন্ম দিয়ে চলেছে। এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পথ না পেয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ ক্রমাগত সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকছে। ফলে পুঁজিবাদ আজ আরও বেশি করে সামরিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এটা কি উন্নত, কি অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। সেই কারণেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই চূড়ান্ত সঙ্কট ও অনিশ্চয়তা তার উপরিকাঠামোতে, অর্থাৎ সমাজের নীতিনৈতিকতা ও সংস্কৃতির জগতে প্রতিফলিত হচ্ছে। উপরিকাঠামো বলতে আমরা রাজনীতি, আদর্শ, শিল্প, সংস্কৃতি, রুচি ও দর্শনগত ধারণাকে বুঝিয়ে থাকি। এইগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক ভিত্তির (base) উপরিকাঠামো (superstructure) বলি। ফলে এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সঙ্কট ও সমস্যার তীব্রতা এবং অস্থিরতা স্বাভাবিকভাবেই উপরিকাঠামোতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কমরেডস্, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের সমস্ত সমস্যা এবং সমাজের সকল ব্যাধির মূল কারণ।

আপনারা সবসময় মনে রাখবেন, আমাদের দেশের বিপ্লবটা যেহেতু পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেইহেতু এই বিপ্লবকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সমস্ত আপসকামী শক্তি — সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির সকল ধারাকে আদর্শগত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর ‘গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব’ এবং তার প্রয়োগের প্রকৃত লক্ষ্য কি তা বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন এমন কিছু উপরতলার তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষকে বাদ দিলে জনসাধারণের বিরাট অংশের কাছেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সমস্ত প্রকার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তাদের তত্ত্ব ও কৌশলের আসল চরিত্র কি তা আজও ব্যাপক জনসাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আজও একথা বুঝতে পারছেন না যে, ভারতবর্ষে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র রয়েছে যা চীন দেশে ছিল না। তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি এবং রণকৌশল আসলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে বাস্তব প্রক্রিয়াটি কাজ করছে তাকে অস্বীকার করে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা অলীক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। জনসাধারণের দৃষ্টিকে বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেটা মূল প্রশ্ন, অর্থাৎ মূল শত্রুর থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা কাল্পনিক শত্রুর দিকে পরিচালিত করাই হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ও কৌশলের আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এটি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির অন্যতম একটি ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং আপনারা যদি সত্যি সত্যিই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে চান তাহলে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য আদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে একদিকে ইন্দিরা গান্ধীর গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নক্সা, অপরদিকে সকল ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ও কৌশল — এই দুটিকেই আপনাদের পরাস্ত করতে হবে। মনে রাখবেন, এর বাইরে যাঁরাই যে কোন অজুহাতে অন্য কিছু ভাববেন তাঁরা আসলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির খপ্পরে গিয়ে পড়বেন।

কমরেডস্, আমি হাওয়ায় কথা বলা পছন্দ করিনা। এটা আমার অভ্যাস নয়। আমি যখন কিছু বলি তখন সেই বিষয়ের মধ্যে মনকে পুরোপুরি নিবিষ্ট করেই বলি। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা আমার আলোচনাতে মনঃসংযোগ করবেন — নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে এ দাবি করার অধিকার আমার আছে।* আমি জানি, যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি তা আপনাদের কাছে একটু কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপনাদের তো বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সে কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাই আপনাদের জানতে হবে, বার বার করে জানতে হবে, বার বার করে আপনাদের শিখতে হবে। হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও আপনাদেরকে অনেক কিছু জানতে হবে। সমস্যা সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে আপনারা কিছুতেই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারবেন না। একথা আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শেষপর্যন্ত আপনাদের চূড়ান্ত ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই আপনাদের হতে হবে অত্যন্ত মনোযোগী ও যত্নশীল। একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনারা সবাই বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনারা, ছাত্ররা-যুবকরা, সাহস ও দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন, দেশের জন্য ভাল কিছু করবেন — একথা ভাববার মত তেজ যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। তা না হলে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমি অন্তত এর কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

কমরেডস্, যদিও এখানে বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ আর আমি আপনাদের বেশী সময় নেব না। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা যে তীব্র ও ব্যাপক আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এখন সেই বিষয়টি আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই। কেননা, ছাত্রজীবন পার করার পর আপনাদের সবাইকেই বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আপনাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় গুটিকয়েক বিপ্লবী কর্মী ছাড়া ব্যাপক ছাত্র-যুব সম্প্রদায়, যাঁরা বিপ্লবের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবী সংগ্রামে নিষ্ঠা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে

* হলের এক কোণে দু'জন সেই সময় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না তাদের প্রত্যেককেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমি ব্যাপক ছাত্র-যুব সমাজের সেই বৃহত্তর অংশের কথাই বিশেষ করে এখানে বলছি। তাদের কাছে এটা অত্যন্ত বাস্তব এবং হৃদয়বিদারক সমস্যা। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তাদের সকলকেই এই মারাত্মক বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ছাত্রাবস্থায় যেসব সমস্যা অনেকেই অনুভব করতে পারেননি, বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক বহু সমস্যা তখন তাঁরা অনুভব করবেন। যখন তাঁরা পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করবেন, দায়িত্ব নেবেন, বিয়ে করবেন, সন্তানসন্ততির জন্ম হবে, তখন তাঁরা বুঝতে শুরু করবেন, কেমন ধরনের সমাজপরিবেশের মধ্যে তাঁরা বাস করছেন। তখনই তাঁরা দেখবেন তাঁদের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে চলেছে। একথাও তাঁরা বুঝবেন শুধুমাত্র আত্মীয়পরিজন নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি যে ব্যাক্তিগত জীবনকে (private life) তাঁরা একান্ত গোপনীয় ও পবিত্র বলে মনে করেন তার উপরেও বর্তমান সামাজিক ব্যাধিগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং ফল বর্তাবে। বোধহয় সেইদিন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এমনকি তাঁদের একান্ত গোপনীয় এবং তথাকথিত পবিত্র ব্যক্তিগত জীবনকেও তাঁরা বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সমাজপরিবেশে কলুষিত ও অধঃপতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননা। এটাই যে তাঁদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি — হয়ত সেইদিনই তাঁরা তা বুঝতে পারবেন। ফলে এই ধরনের অর্থহীন, অধঃপতিত, অবমাননাকর এবং পরগাছার মত জীবনযাপনের স্বপ্ন না দেখে আমরা যদি আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাধীন, অবাধ, সর্বাঙ্গীণ ও দ্রুততম বিকাশের, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রুচিগত সমস্ত দিক থেকে সুস্থ জীবনযাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেবার প্রয়োজনে আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্তন আনার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি সেটাই কি শ্রেয় নয় ? তার জন্য আপনাদের একটি বিপ্লবী মতাদর্শ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করতে হবে — যা শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সমস্ত ঘটনাকে বিচার করে এবং যা আপনাদের সামনে এই শিক্ষাটিই তুলে ধরে যে, যদি আপনারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চান তাহলে আপনাদের লড়াই করবার

ক্ষমতা আয়ত্ত করার সাথে সাথে গড়ে তুলতে হবে একটি অনুসন্ধিৎসু মন এবং প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও শেখবার মানসিকতা। এইভাবে সমস্যাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে এবং আপনাদের চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ রূপ দিয়ে আপনারা সঠিক পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন। তাই মার্কস একদিন সারা দুনিয়ার শোষিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, কামান, বহু বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে, আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা, আপনাদের হাতে রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যা এমন একটি বিজ্ঞান এবং এমনই শক্তিশালী হাতিয়ার যে, যদি একে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায় তাহলে তা অপরাজেয় শক্তির জন্ম দিতে পারে। আপনারা যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন একমাত্র তখনই বিপ্লবের উপলব্ধি আপনাদের প্রাঞ্জল হবে, সমাজবিকাশের প্রক্রিয়াকে আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন এবং সমাজ অভ্যন্তরের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী — যা সমাজের প্রতিটি কার্যকলাপ, ঘটনা ও বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে চলেছে সেগুলোকে খুঁজে বের করতে ও বুঝতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ, আপনারা যদি শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করতে পারেন একমাত্র তখনই আপনারা অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হবেন এবং শেষপর্যন্ত দুনিয়াকে জয় করতে পারবেন। হ্যাঁ, বাস্তবিকই আপনারা গোটা দুনিয়াকে জয় করতে পারেন যদি এই বিজ্ঞানকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আয়ত্ত করতে পারেন। কেননা কোন অস্ত্রই এর কাছে দাঁড়াতে পারেনা। শ্রমিকশ্রেণী, জনসাধারণ ও শোষিত মানুষের হাতে এটা একটা অমোঘ অস্ত্র। ফলে বর্তমান মুহূর্তে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি — যা অমোঘ ও সৃষ্টিশীল এবং যে জ্ঞান সমাজবিকাশের যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া তার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে বোঝবার ক্ষমতা অর্জনে আপনাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এইভাবে জনসাধারণের সংগ্রামে এবং প্রতিদিনের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিযুক্ত করার সাথে সাথে যদি আপনারা নিজেদের

রাজনীতিগত ও আদর্শগত দিক থেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারেন, একমাত্র তখনই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীসংগ্রামগুলি যে বিশেষ বিশেষ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত তা ধরতে আপনারা সক্ষম হবেন এবং একটি বিশেষ সমাজ পরিবেশে তার সমস্ত বৈচিত্র্য, তার গড়ে ওঠা ও বিকাশের ধারাকে আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। কাজেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল একটি বিজ্ঞান যা আপনাদের অত্যন্ত যত্নের সাথে পড়তে হবে এবং বার বার পড়তে হবে। কেবলমাত্র বই লেখার জন্য বা নিজেদের খেয়ালখুশিমত উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নয় — তা এমনভাবে আপনাদের অধ্যয়ন করতে হবে যাতে আপনারা একে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং জনসাধারণের কাছে তাদের বোঝবার মত করে নিয়ে যেতে পারেন। মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, জানা আর উপলব্ধি করা — এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যদি আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে আপনারা জনসাধারণের কাছেও তাকে অত্যন্ত সহজভাবেই উপস্থাপনা করতে পারবেন এবং দেখবেন জনসাধারণও সহজেই তা বুঝতে পারছেন। কারণ, মার্কসবাদ একটা জীবন দর্শন এবং আমার কথা যদি ধরেন, আমি গ্রাম-শহরে অশিক্ষিত চাষি-মজুরদের অনেক শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেছি। সেখানে আমি দেখেছি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, এমনকি বিজ্ঞানের জটিল সূক্ষ্মতম বিষয়গুলিও চাষি-মজুররা বুঝতে পারে এমন ভাষায়, এমন ঢঙে তাদের কাছে আলোচনা করা যায় তাহলে তারা তা বুঝতে পারে এবং অশিক্ষিত হয়েও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় ভালই বুঝতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কারণ আমি নিজে গ্রাম-শহরে স্কুল পরিচালনা করি। তাই আমি মনে করিনা যে, এটা এমন কঠিন — যা অশিক্ষিত-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে আয়ত্ত করা, বোঝা এবং উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বরং আমাদের এটা সবসময় মনে রাখা দরকার যে, এটা একটা জীবনদর্শন এবং সেই অর্থে আজকের দিনে শ্রমিকশ্রেণীর, নিপীড়িত জনগণের এবং দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের জীবনদর্শন। তারাই একে সব থেকে ভালভাবে বুঝতে পারে যদি তাদের কাছে এটা নিয়ে যাওয়া যায় এবং যেভাবে, যে ভাষায়, যে ঢঙে বললে তাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা তেমনভাবে

তাদের কাছে উপস্থাপনা করা যায়।

সুতরাং আপনারা যদি প্রত্যেকেই এই সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলে সমষ্টিগতভাবে শপথ গ্রহণ করেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস নিশ্চিতভাবে একটা নতুন মোড় নেবে। হলের দিকে তাকিয়ে দেখুন — কত ছাত্র, কত যুবক আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন। যদি আপনারা সকল বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং সংগ্রামের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন তাহলে আপনারা বর্তমান এই সঙ্কটের মধ্যেও নিশ্চিতভাবে পথ করে নিতে পারবেন।

কমরেডস্, মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কোনদিনই সংখ্যায় বেশি থাকেন না। তাঁরা সব সময়েই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। প্রতিটি দেশে সমাজবিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র যুবরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান, হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, সংগঠিত করেন, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। এরপরই সময় আসে গণঅভ্যুত্থানের, আর তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। তার আগে আপনাদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে — যা কঠোর, কঠিন, কষ্টকর, কিন্তু আনন্দময়। আমি বলি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ। হ্যাঁ, সংগ্রামের এই পথকে অত্যন্ত বেদনাময় মনে হতে পারে, কখনও কখনও তা খুবই কষ্টসাধ্যও হতে পারে — তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মর্যাদাময় জীবনযাপনের এটাই একমাত্র পথ। এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে — কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। অবমাননা এবং গ্লানি নিয়ে কুকুর-বেড়ালের মত রাস্তায় পচে মরবেন না। মনে রাখবেন, মানুষমাত্রই মরণশীল। তাই মরতে যখন হবেই তখন নিজেকে করুণার পাত্র করে, অবমানিত করে, ভিক্ষুকের মত মরবেন না। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মর্যাদার সাথেই মৃত্যুকে বরণ করুন। আর মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবার বা মৃত্যুকে বরণ করবার একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের

যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা। বলাবাহুল্য, এর জন্য অতি অবশ্যই হাজারে হাজারে আপনাদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

কমরেডস্, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করুন, সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগকে সবসময় এগিয়ে নিয়ে চলুন।

আপনাদের স্লোগান হবে — জনসাধারণের কাছে যাওয়া, তাদের সংগঠিত করা, তাদের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা — যাতে করে মেহনতী মানুষ একদিন নিজেরাই অস্ত্রধারণ করতে পারে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ